ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 610-615
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.049

বিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি : প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প

রাকেশ চন্দ্র সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঙ্গাপাড়া মহাবিদ্যালয়, আসাম, ভারত*

Received: 10.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

After the World War-I, the morale value of people was discouraging in the world and in the midst of crisis; a number of writings were developed by the Bengali writers. The Bengali writers created a history by their valuable writings in this period. The famous Bengali writer who has been remembering for his revolutionary writings after World War-I was Manik Bandyopadhyay. Manik Bandyopadhyay was born at the time of Swadeshi Movement, Boycott Movement and First World War. He witnessed the critical days after the Great War when the world was facing economic depression. As the capitalists continuously exploited the innocent villagers, the people of Bengali middle class became the pray of this misdeed. Similarly, the British domination was also increasing day by day. This created atrocities in the minds of the people of Bengali middle class. So, the main topics of the writings of Manik Bandyopadhyay included the conditions of middle-class people, movements of labour class etc. Interesting was that, Manik Bandyopadhyay's writings reflected his inclination towards Marxism. The novels of Manik Bandyopadhyay namely, Putulnacher Itikatha, Dibaratrir Kabya, Padma Nadir Manjhi etc. and the short stories namely, Otashimami, Pragaitihashik, Chotobokulpurer Jatri, Sare Sath Ser Chal etc. are considered important and valuable creations of this well-known writer. All the writings of Manik Bandyopadhyay contain the lives and other issues of the people of Bengali middle people.

Keywords: Middle Class, Crisis, Swadeshi, Exploitation, Marxism.

কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯মে ১৯০৮ সালে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা শহরে। তার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাকনাম মানিক। সেটাই তিনি লেখক-নাম করে তোলেন। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের চতুর্থ পুত্র বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি পড়ার সময় প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখেন এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে।

সাহিত্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ অভিভাবকদের সহানুভূতি পায়নি। বরং বিরোধিতা এসেছে। কিন্তু সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ তাঁর নিজের পথ বলে মনে করেন মানিক। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যকর্মকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনের দু-চার বছরের চাকরি ছাড়া সাহিত্যরচনাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। "লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি।"[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'জননী', 'চিহ্ন', 'হরফ' ইত্যাদি। লিখেছেন তিনশোর বেশি গল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল, 'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'বউ', 'পরিস্থিতি', 'লাজুকলতা 'ইত্যাদি। মানিকের প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'লেখকের কথা'।

প্রয়াত সমালোচক ও কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন আঙ্কিকের স্থির-মস্তিষ্ক নিয়ে 'কেন'-র উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর দৃষ্টি মোহ ও পূর্বসংস্কারমুক্ত। তিনি বিজ্ঞানজীবী।" লেখালেখি সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন "জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।। দান করি বলা ঠিক নয়, -পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে-আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেত না।"[২] তাঁর লেখায় মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষ এর কথা বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের অন্যতম সংস্থান হলো খাদ্য। খাবারের জন্যই নিয়মিত সংঘর্ষ করতে হয়। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পে দেখা যায় অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের কাতর আর্তনাদ। আধার রাতে সন্ন্যাসী যখন পিঠে সাড়ে সাত সের চাল নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরছিল তখন তার মনে ভয় ছিল কেউ তার চাল ছিনিয়ে না নেয়। এতটাই অন্য কষ্ট যে মানুষ একে অন্যের খাবার করে খেতে বাধ্য হচ্ছে। সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভেসে ওঠে খাবার এর যন্ত্রনার নিদারুণ চিত্র। "-না খেতে পেয়ে কজন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! কজন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে- তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে- তার সাড়ে সাত সের চালের দু-মুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবনমরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো- সর্বনাশ।"[৩] খাবারের অভাবে যে শুধু মানুষ মারা যেতে পারে তা নয়, সেই সাথে পশু-পাখিও মারা যায়। "মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠাণ্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁতছ্যাঁত করে উঠল।"[৪]

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান -এই তিনের সমাহারেই চলে জীবন। জীবন যুদ্ধে কখনো খাদ্য সংকট, আবার কখনো বাসস্থানের সংকট দেখা যায়। "পলাশমতিতে প্রবেশপথের ধারেও তেমনই একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্ছার বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়িটা শূন্য, মানুষ নেই। 'বাঞ্ছা' ! সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু-একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনই ক্ষীণ

আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে, কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে-নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'কে?', সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোন কিছুর চলার মচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট-নবছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়েনি এখনও। বেড়া নেই। পাশের ছোটো কলাবাগান আর সবজি খেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।"[৫] আসলে কোন ঘরে কেউ নেই তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে অথবা মারা গিয়েছে। "সবাই যখন বেঁচে ছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধু? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল্? কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধু? ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।"[৬] এই ভাবেই কতশত মানুষ রোজ জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে নিঃশব্দে মারা যায়।

খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তিনটি মিলেই যখন জীবনচক্রের অপরিহার্যতা। 'সাড়ে সাত সের চাল' গল্পে দেখা গেছে খাদ্য ও বাসস্থানের সংকটময় পরিস্থিতি। ঠিক তেমনি বস্ত্র মানুষের লজ্জা নিবারণের এক অন্যতম আধার। সেই বস্ত্র সংকট নিয়েই লেখা 'দুঃশাসনীয়' গল্প। "কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।"[৭]

হাতিপুর গ্রাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে তলিয়ে গিয়েছে। "দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু -নিরুদ্ধার, এ-জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।"[৮] আসলে বস্ত্রের অভাবে রাতের অন্ধকারে নিজেদের লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় ছায়া মূর্তি হয়ে উঠেছে। ভোলা নন্দী নিজের ধুতিখানা বাড়ির মেয়েদের দিয়েছে। ভোলার বউ কাপড় পড়ে বাইরে কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে মেয়েকে দেয়। মেয়ে সেই ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে বাইরে যায়। এইভাবে একটি ধুতি দিয়েই বাড়ির মেয়েরা বাইরে বের হয়। বিপিন সামন্তের মতো মুনাফা লোভী মানুষের লোলুপ দৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা পায়না বিন্দীর মতন সাধারণ মেয়েরা। "এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসি শাড়ি পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ-কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রিতক, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপিচুপি ঘাটে আসত দুটো-চারটে বাসন আর কলসি নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগি?"[৯]

মানদা সব দেখেও কিছু বলার ও করবার থাকে না। কারণ সে নিজেও অসহায়। যদিও বিন্দি এই ফাঁদ থেকে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু কাপড়ের জন্য ছাড়তে পারে না। "অ বিন্দু! দাঁড়া'। রঘু ডাকে। বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল-কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে'। বেনারসি পরা মালতী বলে, 'ইহিরে, খুকি মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড়

খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ, নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে।"[১০] চাষির ঘরের বউ রাবেয়া দুর্ভিক্ষের দিনে না খেয়ে কাটিয়েছে কোন কথা বলেনি। কিন্তু নিজের আত্মসম্মান লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের অভাবে সে পায়খানার চটের পর্দা গায়ে জড়িয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে চেয়েছে। স্বামী আনোয়ারকে রাগ ও আক্ষেপ করে জানিয়েছে। "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়ারা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী!"[১১] তাই রাবেয়ার মত মেয়েদের শেষে পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়।

গ্রামের সকল চাষি মজুর মিলে অনেক চেষ্টা করেও কাপড় জোগাড় করতে ব্যর্থ কারণ কালোবাজারিতে ভরে গিয়েছে সমাজ। "আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ-শ চাষি ও কামার কুমোর জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াই-শ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার সতেরজন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতেরো মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিন-শ তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ' গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস।"[১২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প হল 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে!' গল্পে মধ্যবিত্ত মৃত্যুঞ্জয় কিভাবে ধীরে ধীরে ফুটপাতের হতদরিদ্র নিরন্ন মানুষের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, একসময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাত ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভাল আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারও বুকে নালিশ নেই, কারও মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝে নি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।"[১৩]

মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাতের মৃত্যু দেখে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে । নিজের অর্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মতো মানুষেরা বুঝতে পারেনা যে সমুদ্রে এক বালতি জল নিক্ষেপের নেয় হচ্ছে। "যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা।"[১৪] মৃত্যুঞ্জয়ের এই সমাজে নিজেকে উৎসর্গ করা দেখে বন্ধু নিখিল বারংবার সজাগ করার প্রয়াস করেছে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থতাই পরিণত হয়েছে। গল্পের শেষে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাতের ভিড়ে মিশে

গিয়েছে। "তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি ক'রে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!"[১৫]

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে দেখা যায় ডাকাত ভিখু বাঁচার তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। ডাকাতির সময় তার একটা হাতে আঘাত লেগে অকেজ হয়ে যায়। সেই অকেজো হাতের সাহায্যেই সে ভিক্ষা দিয়ে রোজগার শুরু করে। "কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম-ভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায়, কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটি সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নীচে গিয়া বসে।"[১৬]

ভিখু যৌবনের জ্বালা অনুভব করে। "রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে। নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।"[১৭] ভিখু যৌবনের তাগিদে পাঁচী ভিখারীকে সঙ্গী করেছে। পাঁচীর সঙ্গী বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে পাড়ি দেয় অজানা পথে।

'হলুদ পোড়া' গল্পে বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্প শুরু হয়। শুভ্রার দাদা স্কুলের মাস্টার হলেও মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। গ্রামে নবীনের মত শিক্ষিত ছেলেও যে অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে বের হতে পারে না। তার প্রমাণ মেলে স্ত্রী দামিনের অসুস্থতায় মন্ত্র তন্ত্রের মাধ্যমে ভালো করার প্রচেষ্টায়। কুঞ্জ গুনীন এর কাজকর্ম গ্রামের লোকেরা ভিড় করে কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে উপভোগ করতে চায়। "এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে, কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল। তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল। 'কে তুই? বল, তুই কে?' 'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।"[১৮]

শুধুমাত্র দামিনীর প্রতি নয়। গ্রামের প্রতিটি মানুষ কুসংস্কার বশীভূত হয়েছে। তাই তো ধীরেনের স্ত্রী গ্রামের ক্ষেন্তি পিসির কাছে জেনেছে কিভাবে ভূতকে আটকানো সম্ভব। "নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও।"[১৯]

মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র মানুষের মুখের কথা সাহিত্যের পাতায় কথাশিল্পী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তার সাবলীল কলমের মাধ্যমে। 'শিল্পী' গল্পে মদন তাঁতি কিভাবে সুতোর অভাবে খালি তাঁত চালিয়ে নিজের পায়ের যন্ত্রণাকে লাঘব করেছে। আবার 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে যোগী ডাকাতের বর্ণনায় দেখা যায় খাদ্যাভাবের চরম দুর্দশা। এছাড়াও 'টিচার', 'হারানের নাত জামাই', 'ছোট বকুলপুর এর যাত্রী', প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যা সমকালীন সমাজের ভাষ্য।

তথ্যসূত্র:

১) চক্রবর্তী, যুগান্তর, (সম্পাদনা) 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ভূমিকাংশ ১০।
২) তদেব, পৃ. ভূমিকাংশ ১০।
৩) তদেব, পৃ. ৮৮।
৪) তদেব, পৃ. ৮৯।
৫) তদেব, পৃ. ৮৯।
৬) তদেব, পৃ. ৯০।
৭) তদেব, পৃ. ৯১।
৮) তদেব, পৃ. ৯১।
৯) তদেব, পৃ. ৯২।
১০) তদেব, পৃ. ৯৩।
১১) তদেব, পৃ. ৯৪।
১২) তদেব, পৃ. ৯৪।
১৩) তদেব, পৃ. ৮৬।
১৪) তদেব, পৃ. ৮৬।
১৫) তদেব, পৃ. ৮৭।
১৬) তদেব, পৃ. ১৪।
১৭) তদেব, পৃ. ১৫।
১৮) তদেব, পৃ. ৭৮।
১৯) তদেব, পৃ. ৮১।